একটি জীবনী, একটি অধ্যায়

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ফ্রান্সিস হুইন-এর লেখা *কার্ল মার্ক্স : আ বায়োগ্রাফি*। তার পরে গত দু'দশকে মার্ক্সের অনেকগুলি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। হুইনের কাজটি এক অর্থে মার্ক্সের জীবন-চর্চায় এই সাম্প্রতিক জোয়ারের অগ্রদূত। বইটি এখনও মূল্যবান, লেখার প্রসাদগুণে দ্বিগুণ মূল্যবান। ২০০৬ সালে তিনি আর একটি জীবনী লেখেন। তার নাম *দাস কাপিটাল : আ বায়োগ্রাফি*। সওয়া-শো পৃষ্ঠার বইটি তিন ভাগে বিন্যস্ত : জেস্টেশন (প্রস্তুতি), বার্থ (জন্ম) এবং আফটারলাইফ (উত্তরজীবন)। *ক্যাপিটাল*-এর, বিশেষত তার প্রথম খণ্ডের হয়ে-ওঠার অতিবিলম্বিত কাহিনি, সেই কাহিনিতে নিহিত এক অ-সামান্য জীবনের আবেগ ও যন্ত্রণা, কিছু নির্বাচিত দেশে ও সমাজে এ-গ্রন্থের প্রভাব—অনায়াস দক্ষতায় উন্মোচন করেছেন ব্রিটিশ লেখক ও সাংবাদিক, ওই স্বল্প পরিসরেই।

এই দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থের কয়েকটি অনুচ্ছেদে ফ্রান্সিস হুইন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন *ক্যাপিটাল* প্রথম খণ্ডের তেত্রিশতম এবং অন্তিম অধ্যায় ('দ্য মডার্ন থিয়োরি অব কলোনাইজেশন') নিয়ে। আক্ষরিক অর্থে শেষ অধ্যায় হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এটিকে সংযোজন বলা চলে। হুইন এই অধ্যায়কে বলেছেন 'কোডা', অর্থাৎ— পশ্চিমী ধ্রুপদী সঙ্গীতের পরিভাষায়—সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হওয়ার পরে একটি বাড়তি অংশ, যা সমগ্র কাজটিকে এক বিশেষ মাত্রা দেয়। বস্তুত, পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়ার সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ তার আগের অধ্যায়েই ('দ্য হিস্টরিকাল টেন্ডেন্সি অব ক্যাপিটাল অ্যাকিউমুলেশন') সম্পূর্ণ হয়েছে। অন্তর্নিহিত সঙ্কটের চাপে কীভাবে ধনতান্ত্রিক/পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি অবশেষে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে, তার অসামান্য বিবরণের চূড়ান্ত বাক্যগুলি পরবর্তী ইতিহাসে সমাজবিপ্লবের প্রত্যয়ী নির্ঘোষে পরিণত : "উৎপাদনের উপকরণের কেন্দ্রীকরণ এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ এমন এক অবস্থায় পৌঁছোয়, যেখানে তাদের পুঁজিবাদী খোলসের সঙ্গে তাদের আর সামঞ্জস্য থাকে না। খোলসটি ফেটে চুরমার হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির ঘণ্টা বাজে। যে শোষকরা (অন্যের সম্পদ) দখল ও আত্মসাৎ করে, তারাই দখল ও আত্মসাৎ হয়ে যায়—দি এক্সপ্রোপ্রিয়েটরস আর এক্সপ্রোপ্রিয়েটেড।"

কিন্তু এই চূড়ান্ত ঘোষণার পরে মার্ক্স 'উপনিবেশ নির্মাণের আধুনিক তত্ত্ব' নামক আরও একটি অধ্যায় যোগ করেন। তার শুরুতেই তিনি জানান, "এখানে আমাদের আলোচ্য হল যথার্থ উপনিবেশ, অর্থাৎ যেখানে নতুন জমিতে স্বাধীন অভিবাসীরা বসতি তৈরি করেছে।" অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড তো বটেই, উত্তর আমেরিকাও আছে তাঁর আলোচনার পরিসরে, কারণ, "অর্থনীতির বিচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও ইউরোপের উপনিবেশ।" এই ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা যে ভাবে চলে, ব্রিটিশ অর্থনীতির মতো পুঁজিবাদী

ব্যবস্থার সঙ্গে তার একটা বড় তফাত আছে। মার্ক্স সেই পার্থক্যের বিশ্লেষণ করেন এবং তার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বরূপ উন্মোচনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। তার ফলে, ওই অধ্যায়টি আর নিছক সংযোজন থাকে না, হয়ে ওঠে মার্ক্সের মহাগ্রন্থের এক মহার্ঘ সম্পদ। যথার্থ 'কোডা'।

এই অধ্যায়ে মার্ক্স বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছিলেন *ইংল্যান্ড অ্যান্ড অ্যামেরিকা* নামক দু'খণ্ডের একটি বইকে। লেখকের নাম এডওয়ার্ড গিবন ওয়েকফিল্ড। তাঁর সম্পর্কে প্রথমে দু'একটা কথা বলা দরকার। ওয়েকফিল্ড (১৭৯৬-১৮৬২) ইংরেজ, জন্ম লন্ডনে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে উপনিবেশ তৈরিতে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল, যার সুবাদে এক সময় নিউজিল্যান্ডে পার্লামেন্টের একটি আসনও সংগ্রহ করেন তিনি। ওয়েলিংটনে তাঁর স্মারক-টারকও আছে। সম্প্রতি অবশ্য সেই স্মারক অপসারণের দাবি উঠেছে, কারণ ১৮২৭ সালে তিনি স্বদেশে এক নাবালিকাকে অপহরণ ও জোর করে বিয়ে করেন, তার সম্পত্তি দখলের জন্য; নানা রকম প্রতারণার অভিযোগে তিন বছর জেলও খাটেন। আর, জেলে বসেই ভাবনাচিন্তা শুরু করেন, কী করে অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ উপনিবেশকে যথেষ্ট লাভজনক করে তোলা যায় এবং, বলা বাহুল্য, সেই লাভের একটা পুরুষ্টু অংশ নিজের তহবিলে ঢোকানো যায়।

বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়। ওয়েকফিল্ডের বুদ্ধি ছিল। পাটোয়ারি বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি লক্ষ্মীলাভের একটি পথ বার করেছিলেন, তার নাম : সিস্টেম্যাটিক কলোনাইজেশন, মানে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে উপনিবেশ গঠন। অর্থনীতির প্রচলিত শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল। পড়াশোনা করে এবং খোঁজখবর নিয়ে ওয়েকফিল্ড জানলেন যে, অস্ট্রেলিয়াতে যারা গিয়েছে বা যাদের সেখানে পাঠানো হয়েছে, তারা সেই অতিকায় দেশে প্রচুর জমি পেয়ে গিয়েছে জলের দরে অথবা বিনা মূল্যে। (অবশ্যই যেখানে দরকার হয় আদিবাসী মানুষদের মেরে সাফ করে দিয়েছে—এ ব্যাপারে উত্তরের আমেরিকা আর দক্ষিণের অস্ট্রেলিয়ায় সাহেবি কেতা একই রকম!) সেই অভিবাসীরা যে যার নিজের জমিতে চাষবাস, পশুপালন ইত্যাদি করে, ফলে আলাদা করে বাজারে শ্রমিকের জোগান খুবই সীমিত। এই অবস্থায় ক্রমাগত উৎপাদন বাড়ানোর উপায় নেই, সুতরাং বিনিয়োগ বাড়িয়ে চলার তাগিদও কম। আবার, জনবহুল ব্রিটেন থেকে ভাগ্যান্বেষীদের যথেষ্ট অভিবাসনের উৎসাহও থাকছে না, কারণ সহজলভ্য জমির বেশির ভাগই বিরাট বিরাট জোত হিসেবে ইতিমধ্যেই দখল হয়ে গিয়েছে। এর ফলে এক দিকে ওই উপনিবেশের তেমন সমৃদ্ধি নেই, অন্য দিকে ব্রিটেনে দরিদ্রের সংখ্যা কমানোর একটা সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে।

বুদ্ধিমান ওয়েকফিল্ড বললেন, উপনিবেশের জমি ভাগ ভাগ করে বিক্রি করা হোক, ভাল দাম নেওয়া হোক ক্রেতাদের কাছে, সেই টাকার একটা অংশ কাজে লাগানো হোক ব্রিটেন থেকে অভিবাসী নিয়ে গিয়ে নতুন বসতি তৈরির বন্দোবস্ত করতে। ওই অভিবাসীদের বেশির ভাগেরই নিজের টাকাকড়ি নেই, তারা জমি কিনতে পারবে না, অন্যের জমিতে খাটবে। অনেক দিন খেটেখুটে পয়সা জমিয়ে কিছু জমি নিজেরা কিনে ভূসম্পত্তির স্বাধীন মালিক হতে পারে,

তাদের দেওয়া টাকার একটা অংশ দিয়েই নতুন অভিবাসী আনার খরচ মেটানো যাবে। জমির দাম যথেষ্ট চড়া রাখলে যথেষ্ট আয়ও হবে, শ্রমশক্তিরও অভাব হবে না। জমির চাহিদা যত বাড়বে, তার দামও তত বাড়ানো যাবে। এই সুপরিকল্পিত পথে চললে ব্রিটিশ কোষাগারের এবং দালাল-ব্যবসায়ীদের বিস্তর আয় হবে, আবার উৎপাদনও বাড়বে। তা-ই হল। এই পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন পাশ হল। দেখতে দেখতে জমে উঠল লাভের উপনিবেশ। ওয়েকফিল্ডও ধনে এবং মানে বড় হলেন, যেমনটা চিরকালই হয়ে আসছে।

ওয়েকফিল্ড মাথা খাটিয়ে মডেলটি বার করেছিলেন বটে, তবে সে-মডেল আকাশ থেকে তাঁর মস্তিষ্কে এসে পড়েনি, উপনিবেশ সংক্রান্ত নানা ঘটনার খুঁটিনাটি মন দিয়ে জানতে হয়েছিল তাঁকে, সেই সব ঘটনা তাঁকে ভাবনার রসদ জুগিয়েছিল। একটি ঘটনার কথা বিশেষ করে বলতে হয়। মিস্টার পিল-এর কাহিনি সেটি। এই ব্রিটিশ ব্যবসায়ী পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় সোয়ান নদীর বদ্বীপ এলাকায় গিয়েছিলেন, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন হাজার তিনেক লোক এবং উৎপাদনের কাঁচামাল, সরঞ্জাম, সকলের খাওয়া-পরার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যার মোট দাম প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। অর্থাৎ অঢেল জমি কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করবেন বলে যাকে বলে একেবারে সাতঘাট বেঁধে পাড়ি দেওয়া। কেবল একটা ঘাট তিনি বাঁধেননি, বাঁধার কথা ভাবেনওনি। আর তারই পরিণামে ভরাডুবি হল তাঁর। নতুন দেশে পৌঁছোনোর পরে অচিরেই তাঁর সঙ্গের লোকেরা আবিষ্কার করলেন, সেখানে জমি এমনিই পাওয়া যায়। দেখতে না দেখতে তাঁরা যে যার জমি খুঁজে নিয়ে দখল বসালেন, বেচারি পিল সর্ব-হারা হলেন—শেষ পর্যন্ত তাঁর বিছানা করে দেওয়ার বা নদী থেকে জল আনারও লোক ছিল না। এই কাহিনির মর্ম বুঝতে বুদ্ধিমান ওয়েকফিল্ডের অসুবিধে হয়নি। তিনি সিস্টেম্যাটিক কলোনাইজেশনের মন্ত্র দিলেন। তার মূল কথাটি হল : অবাধে জমি পাওয়ার সুযোগ রাখা চলবে না, জমি কিনতে চাইলে যথেষ্ট দাম দিতে হবে। তাতেই মুশকিল আসান হল। পরে অবশ্য অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সে গল্প এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

ব্রিটিশ উপনিবেশ বিষয়ক ওয়েকফিল্ডের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে মার্ক্স তৈরি করলেন এক আশ্চর্য আলোকবর্তিকা, এবং, *ক্যাপিটাল*-এর দীর্ঘ যাত্রাপথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে স্বরূপ তিনি ক্রমে উন্মোচন করেছেন, উপনিবেশ-সঞ্জাত এই আলোয় সেটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন, খুলে ধরলেন। তাঁর কথায় : "... ওয়েকফিল্ড আবিষ্কার করেছিলেন যে, উপনিবেশগুলিতে টাকাকড়ি, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ—এই সব সম্পত্তি থাকলেও একজন মানুষকে পুঁজিমালিক (ক্যাপিটালিস্ট) বলা চলবে না, যদি এই সব কিছুর অপরিহার্য পরিপূরকটি তাঁর নাগালে না থাকে, যার নাম মজুরি-শ্রমিক (ওয়েজ-লেবারার), যে স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, পুঁজি কোনও বস্তু নয়, পুঁজি হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, বস্তুর মধ্যে দিয়ে যে সম্পর্ক মূর্ত হয়।" এর পরেই ওয়েকফিল্ডের লেখায় পাওয়া পিল-এর গল্পটি সংক্ষেপে বলেন মার্ক্স এবং তার পরে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকে জারিত তীক্ষ্ণ ও গভীর মন্তব্য ছুড়ে দেন, "বেচারি মিস্টার পিল, তিনি সব ব্যবস্থাই করেছিলেন, শুধু ইংল্যান্ডের উৎপাদন-সম্পর্ককে সোয়ান নদীর তীরে নিয়ে যাননি।"

বলেছি, ওয়েকফিল্ডের বিবরণকে কাজে লাগিয়ে মার্ক্স এক আলোকবর্তিকা তৈরি করলেন। ঠিকই, তবে তার আলো সাধারণ আলো নয়, অন্তর্ভেদী, রঞ্জন-রশ্মির মতো। তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ঘাটন করে দেয়, যে সত্যকে ওই ব্যবস্থার ধ্বজাধারী অর্থশাস্ত্রীরা—মার্ক্সের কথায় 'পলিটিকাল ইকনমিস্ট'রা—অবাধ স্বাধীনতার মায়াপ্রতিমার অন্দরে আবৃত রাখতে তৎপর। ওয়েকফিল্ডও এই ধারারই অনুগামী। সেই ধারায় ধনতন্ত্রকে বর্ণনা করা হয় লিবারাল অর্থনীতি হিসেবে—এই অর্থে লিবারাল যে, সেখানে বিভিন্ন বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের অবাধ লেনদেন চলে, সেই লেনদেনের ভিত্তিতে এবং তার মাধ্যমেই গোটা ব্যবস্থাটা চালু থাকে। শ্রমের বাজারেও একই নিয়ম। সেখানে পুঁজির মালিকরা শ্রম কিনতে আসেন, শ্রমিকরা আসেন শ্রম বিক্রি করতে। দু'জনেই স্বাধীন। বাজারদরে শ্রম কেনা ও বেচা হয়, অতঃপর বিক্রেতা-শ্রমিক ক্রেতা-মালিকের কাছে কাজ করতে যান। ধনতন্ত্রের প্রবক্তা পলিটিকাল ইকনমিস্ট বলেন : আমার চোখে তো সকলই শোভন। ভক্তবৃন্দ নিশ্চিন্ত প্রতিধ্বনির কোরাস তোলেন : সকলই শোভন, সকলই শোভন।

ব্রিটেন তথা পশ্চিম ইউরোপের যে ভুবনে এই মডেলের জন্ম, সেখানে এই অবাধ এবং স্বাধীন লেনদেনের ধারণাটি তত দিনে সমাজের চিন্তায় বদ্ধমূল হয়েছে। কেন এক দল লোক পুঁজিমালিক হবে আর বাকিরা তাদের কাছে শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে, সে প্রশ্ন যে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু পলিটিকাল ইকনমির ভুবনে এ-প্রশ্নের সৎ উত্তর নেই। সেখানে সম্পদের একটা প্রাথমিক বণ্টন ধরে নিয়েই আলোচনা শুরু হয়, ওই প্রাথমিক বণ্টন কোথা থেকে এল সে-প্রশ্ন উহ্য থাকে, চেপে ধরলে বড়জোর বলা হয় যে, প্রতিযোগিতার বাজারে যারা উদ্যমী এবং পারঙ্গম তারাই নিজের কৃতিত্বে পুঁজির মালিক হয়ে উঠতে পারে, অন্যরা পারে না, কারণ তাদের সেই তাগিদ নেই, সেই সামর্থ্য নেই; কিংবা শোনানো হয় একটা আদি 'সামাজিক চুক্তি'র গল্প। *ইংল্যান্ড অ্যান্ড অ্যামেরিকা*-র প্রথম খণ্ড থেকে তেমন গল্প-নির্মাণের একটি দৃষ্টান্ত তুলে এনেছেন মার্ক্স, যেখানে ওয়েকফিল্ড লিখেছিলেন, "পুঁজি জমিয়ে তোলার জন্য মানুষ... একটা সহজ কৌশল করেছে... তারা নিজেদের পুঁজির মালিক এবং শ্রমের মালিক, এই দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছে... এই বিভাজন সমন্বয় এবং সমাহারের ফল (দ্য রেজাল্ট অব কনসার্ট অ্যান্ড কম্বিনেশন)।" এই উদ্ধৃতির মাঝখানে মার্ক্স ফুট কাটেন : পুঁজি বাড়িয়ে তোলার মহান কর্তব্যটি তো "সেই (আদিপুরুষ) অ্যাডামের কাল থেকে মানবজাতির সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তার চূড়ান্ত এবং একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে"! এ-ধারণার আধিপত্য আজ সহস্রগুণ জোরদার—গোটা দুনিয়ার মানবসমাজে এই বিশ্বাস আজ অতি প্রবল যে, মানুষের সন্তানেরা সভ্যতার ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকেই কেবল আরও আরও আরও পুঁজির জন্ম দেবে বলে 'পৃথিবীর বীজখেতে আসিতেছে চলে'।

মার্ক্স বললেন, এ হেন সামাজিক চুক্তিই যদি মানুষকে পুঁজিমালিক আর শ্রমিক, এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করে থাকে, তবে সোয়ান নদীর কূলে মিস্টার পিলের তৈরি উপনিবেশে তো তেমন চুক্তির অতুল সাফল্যের ইতিহাস রচিত হওয়ার কথা ছিল। আনকোরা একখানি সমাজ, এক জনের হাতে উৎপাদনের সব উপকরণ, অন্যরা তাদের গতর খাটাতে পারে—এমন একখানি জুটি তো ধনতন্ত্রের ইমারত গড়ে তোলার পক্ষে এবং সেই ইমারতে ক্রমশ মহলের

পর মহল সংযোজন করার পক্ষে একেবারে রাজযোটক। অথচ বাস্তবে কী হল? ধনতন্ত্রের ভিতপুজোর আগেই নটেগাছটি মুড়োল! এবং উপনিবেশের জমিতে উন্মোচিত হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সত্য : যতক্ষণ মানবসমাজের একটি অংশের হাত থেকে উৎপাদনের উপকরণ সরিয়ে নেওয়া না হচ্ছে, যতক্ষণ নিজের শ্রমশক্তি তার একমাত্র সম্পদ হয়ে না উঠছে, ততক্ষণ সে নিজেই নিজের মালিক হবে, নিজেই নিজের উৎপাদনের ফল ভোগ করবে, অন্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কাজ করবে না। ধনতন্ত্রের ইমারত গড়তে চাইলে আগে সমাজের একাংশকে শ্রমজীবী হতে বাধ্য করা চাই।

এই ধারণাটি *ক্যাপিটাল*-এর শেষ অধ্যায়ে হঠাৎ আবির্ভূত হয়নি, এটি সে-গ্রন্থের, এবং মার্ক্সের সামগ্রিক বিশ্লেষণী কাঠামোর, একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের সূচনাপর্বে ভূমিজীবী মানুষকে কীভাবে তার উৎপাদনের উপকরণ জমি থেকে উৎখাত করে মজুরি-শ্রমিকের সাপ্লাই লাইন তৈরি করা হয়েছিল, সেই আদি-পুঁজিগঠনের স্বরূপ মার্ক্স আমাদের চিনিয়েছেন আট পর্বে বিন্যস্ত *ক্যাপিটাল* প্রথম খণ্ডের শেষ পর্বে। সেই অষ্টাধ্যায়ী পর্বের নাম : 'সো-কলড প্রিমিটিভ অ্যাকিউমুলেশন'। প্রাথমিক পুঁজি গঠনের এই ধারণা আগেও জানা ছিল, অ্যাডাম স্মিথ তার নাম দিয়েছিলেন 'প্রিভিয়াস অ্যাকিউমুলেশন'। মার্ক্স সেই প্রক্রিয়াকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেণি-বিভাজনের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলেন। ওই শেষ পর্বের প্রথম অধ্যায়টির উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন, "আদি-পুঁজিগঠনের ইতিহাসে সমস্ত বিপ্লবই যুগান্তকারী, পুঁজিমালিক শ্রেণি নিজেদের তৈরি করে নিতে সেই বিপ্লবকে প্রকরণ হিসেবে ব্যবহার করে; কিন্তু এটা সেই সব মুহূর্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সত্য, যখন অগণন মানুষকে তাঁদের বেঁচে থাকার সংসাধন থেকে আচমকা জোর করে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং মুক্ত, অরক্ষিত ও অধিকারহীন সর্বহারা হিসেবে ছুড়ে দেওয়া হয় শ্রমের বাজারে। কৃষি-উৎপাদকের, কৃষকের জমি দখল এবং আত্মসাৎ করার এই ব্যাপারটাই গোটা প্রক্রিয়ার ভিত্তি।" এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, "এই দখল ও আত্মসাৎ করার ইতিহাস নানা দেশে নানা রূপ ধারণ করে এবং তার বিভিন্ন পর্ব বিভিন্ন পরম্পরায় চালিত হয়, আর সেটা ঘটে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালপর্বে। একমাত্র ইংল্যান্ডে তার ধ্রুপদী রূপ দেখা গিয়েছে, সেই কারণেই আমরা তাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়েছি।"

এই পরিপ্রেক্ষিতেই মার্ক্স উপনিবেশের অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করলেন এবং ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণে তার গভীর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন। তিনি দেখালেন যে, ইংল্যান্ড তথা পশ্চিম ইউরোপের 'ধ্রুপদী' ধনতন্ত্রের স্বরূপটিকে লিবারাল অর্থনীতির রংমাটি দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, বলা যায় যে, সেই অর্থনীতির অবাধ বাজারে শ্রমের চাহিদা ও জোগানের পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া চলেছে আর তার ভিত্তিতেই চালু থাকছে উৎপাদন ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় শ্রমিক ও মালিক একে অন্যের পরিপূরক। কিন্তু উপনিবেশে, নতুন জমির 'যথার্থ' উপনিবেশে এই "সুন্দর মায়াজালটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়", ফাঁস হয়ে যায় ধনতন্ত্রের স্বরূপ, (ধনতান্ত্রিক) পলিটিকাল ইকনমির প্রবক্তাদের "আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তৈরি করা বর্মটি পচা কাঠের মতো খসে খসে পড়ে"। আমরা বুঝতে পারি, "তথাকথিত জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির

স্বার্থে" তাঁরা এমন উপায় খুঁজছেন যাতে "দেশের মানুষের দারিদ্র্য নিশ্চিত করা যায়"। স্পষ্টতই, ওয়েকফিল্ডের 'সিস্টেম্যাটিক কলোনাইজেশন'-এর লক্ষ্যও যথেষ্ট মানুষকে যথেষ্ট দরিদ্র এবং নিঃস্ব রাখা, যাতে তাঁরা উৎপাদনের উপকরণের মালিকের কাছে নিজের শ্রম বিক্রয়ে বাধ্য হন। এই কারণেই প্রয়োজন মাফিক নতুন অভিবাসীদের উপনিবেশে আনার বন্দোবস্ত করার পরামর্শও দিয়েছিলেন তিনি।

উপনিবেশ নির্মাণ বিষয়ক এই শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তিতে মার্ক্স সুস্পষ্ট ভাষায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, উপনিবেশের অবস্থা এখানে তাঁর প্রকৃত আলোচ্য নয়, উপনিবেশের দর্পণে তিনি (পশ্চিম ইউরোপের) পূর্ণাঙ্গ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বরূপটিকে দেখাতে চান, বুঝিয়ে দিতে চান এই মৌলিক সত্য যে—শ্রমজীবীর সম্পত্তি বেদখল ও আত্মসাৎ করে তাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে তুলেই 'পুঁজিবাদী উৎপাদনের এবং পুঁজি বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা'টি (ক্যাপিটালিস্ট মোড অব প্রোডাকশন অ্যান্ড অ্যাকিউমুলেশন) নিজেকে গড়ে তোলে এবং লালন করে। এর মূলে আছে উদ্বৃত্ত শ্রম দখল করে নেওয়ার ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। শ্রমজীবী মানুষ তাঁর শ্রম দিয়ে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করেন, পুঁজিমালিক তা দখল করেই নিজের পুঁজি বাড়িয়ে তুলতে থাকেন, স্ফীত হতে থাকে তাঁর ধনতান্ত্রিক সম্পত্তিও। অন্যের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার এই প্রক্রিয়াই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধর্ম, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের ধর্ম। সর্বহারা শ্রমজীবী সেই সম্পর্কের অপরিহার্য শর্ত। ধনতন্ত্র একই সঙ্গে পুঁজিমালিক এবং সর্বহারা, দুই শ্রেণিকেই 'উৎপাদন' করে চলে।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে ব্যবহৃত একটি বহুচর্চিত বাক্যের ('অল দ্যাট ইজ সলিড মেল্টস ইনটু এয়ার') সূত্র ধরে ফ্রান্সিস হুইন *ক্যাপিটাল*-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীটির শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছিলেন, "আজও যখন শক্তপোক্ত সব কিছু হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, তখনও *দাস কাপিটাল*-এর অনুরণন (শেষ হয়নি), যে শক্তিগুলি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারা—এবং তাদের তৈরি করা অস্থিরতা, বিযুক্তি (এলিয়েনেশন) ও শোষণ—সেই গ্রন্থে যে ভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তা কখনও তার অনুরণন হারাবে না, হারাবে না বিশ্বপৃথিবীর স্বরূপ উন্মোচন করার ক্ষমতাও।"

চোদ্দো বছর আগে লেখা কথাটা আজ, এই ২০২০'র বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত দুনিয়ায় আরও বেশি সত্য। বস্তুত, বিশ্বজোড়া এই সঙ্কট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্দরের চেহারাটাকে যে ভাবে নিরাবরণ করে দিয়েছে—অগণন শ্রমজীবী মানুষের ভয়াবহ বিপন্নতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এবং সেই বিপন্নতাকেই ব্যবহার করে অতিকায় বিশ্ব-পুঁজির মালিকরা এই বাজারে যে মহালুণ্ঠনে মেতেছেন—তা আজও, এত পৈশাচিকতার ধারাবাহিক প্রদর্শনী দেখে অভ্যস্ত হওয়ার পরেও, আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। এক দিকে অভূতপূর্ব বেকারত্ব, অন্য দিকে শ্রমিক-কর্মীদের সমস্ত অধিকার হরণ করে, এমনকি সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে ন্যূনতম রক্ষাকবচটুকুও না দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার উৎকট শোষণ-অভিযান—একে অন্যের পরিপূরক। দেশে দেশে বিপুল সংখ্যক 'প্রিকেরিয়েট' কেবল উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তারা কেবল সমস্ত সমষ্টিগত সম্পদ ('কমনস') থেকে উৎখাত হয়নি, স্থানীয়

কমিউনিটির সীমিত নিরাপত্তা, এমনকি পরিবারের শেষ আশ্রয়টুকুও তারা দ্রুত হারিয়ে ফেলছে, কারণ এই নিয়োলিবারাল অর্থনীতিতে সেই পুরনো কাঠামোগুলি আমূল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সর্বহারা উৎপাদনের এক চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছি আমরা, যা আসলে পুঁজির—এবং পুঁজিমালিকের—চরম স্ফীতির প্রতিবিম্ব, তার আবশ্যিক শর্তও।

অন্য দিকে, এই সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ায় 'পলিটিকাল ইকনমিস্ট'দের আচরণ, যাকে বলে, 'ইন্টরেস্টিং'। নিয়োলিবারাল ধনতন্ত্রের প্রবক্তারা এই মুহূর্তে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছেন, অর্থাৎ কৌশলগত নীরবতা অবলম্বন করে প্রতীক্ষায় আছেন, কবে আবার এই বিপর্যয়ের বিশ্লেষণে দুরূহ মডেল তৈরি করে পেপার ছাপাবেন ও জগৎসভায় জ্ঞান দেবেন। মধ্যপন্থী, লিবারাল অর্থনীতির ধ্বজাধারীরা বেসামাল অর্থনীতিকে খাদের কিনারা থেকে রাস্তার মাঝামাঝি ফেরানোর জন্য নানা সদুপদেশ দিচ্ছেন, যেমন, রাষ্ট্র এবং কমিউনিটির সাহায্যে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অসাম্য কমাতে বড়লোকের আয় এবং সম্পদের ওপর কর বসানো দরকার, ইত্যাদি। অর্থাৎ, সর্বনাশ সমুৎপন্ন হতে দেখে পঞ্চতন্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করে অর্ধেকটা ত্যাগ করে বাকি অর্ধেক বাঁচানোর চেষ্টা আর কি।

বাকি অর্ধেক বাঁচবে কি না, কত দিন বাঁচবে, কী ভাবে বাঁচবে, জানা নেই। ঠিক যেমন জানা নেই, এই অভূতপূর্ব সঙ্কটের অভিঘাতে বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামোটি ভেঙে পড়বে, না কি দুনিয়া জুড়ে শ্রমিক-কর্মীদের প্রচণ্ড বিপন্নতার সুযোগ নিয়ে সেই অর্থনীতির মহা-প্রভুদের শোষণ-প্রতিমা আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার খড়মাটি বেরিয়ে-পড়া কাঠামোটি এই মুহূর্তে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ক্যাপিটাল-এর সেই অমোঘ উক্তির সত্যরূপ "পুঁজি হল মৃত শ্রম (শক্তি), ভ্যাম্পায়ারের মতো যে কেবল জ্যান্ত শ্রমের রক্ত শোষণ করে বেঁচে থাকে।"